অভিচিন্তন

অনুভবের দৃশ্যময়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান-পাঠ

মূল

ড. মালিক বদরী

অনুবাদ

মোঃ লুৎফর রহমান

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

২

অভিচিন্তন

অনুভবের দৃশ্যময়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান-পাঠ

মূল
ড. মালিক বদরী

অনুবাদ
মোঃ লুৎফর রহমান

ISBN
984-70103-0011-5

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারী ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, সফর ১৪৩০

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭, Email : biit_org@yahoo.com

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টাস লিঃ, ঢাকা

মূল্য : ৫০.০০ টাকা, ৫.০০ ডলার

Obhichinton:Onobhober drishyamoyota, Islamer Dristikon Theke Monobigyaner Path (The meditation : from conciousness to seeing/ *Al tafakkur min al mushahada ila al shuhud, dirasa nafsia islamia*) Written by D.Malik Badri and translated into Bengali by Md. Lutfur Rahman, publishcd by BIIT, House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara, Dhaka, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, E-mail: biit_org@yahoo.com.Price : 50.00 Tk. 5.00 Dollar

সূচিপত্র

১।	পূর্বকথা	০৫
২।	ভূমিকা	০৬
৩।	লেখকের ভূমিকা	১২
৪।	আধুনিক মনোবিদ্যার আলোকে অভিচিন্তন	১৪
৫।	চিন্তন-প্রক্রিয়া ও অভিচিন্তন	২৬
৬।	অভিচিন্তান ও স্বজ্ঞালব্ধ/ অলৌকিক ধ্যান	৩৮
৭।	অভিচিন্তনের উৎসাহ-প্রদানে কুরআনের কতিপয় রীতি	৫০
৮।	ইসলাম নিজ বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে	৫৩
৯।	অভিচিন্তন মুক্ত স্বাধীন ইবাদত-উপাসনা	৫৭
১০।	অদৃশ্যবিষয়ে চিন্তামগ্নতা : এর সীমা-পরিসীমা	৬০
১১।	চিন্তাশীলতার স্তরে স্তরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পার্থক্যসমূহ :	৭০
১২।	বস্তুনিচয়ের সঙ্গে অভিচিন্তকের ঘনিষ্টতা	৭৭
১৩।	জাগতিক নিয়মে অভিচিন্তন: পরিপ্রেক্ষিত ধর্ম ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান	৮১
১৪।	তথসূত্র	৯৫

১৪

আধুনিক মনোবিদ্যার আলোকে অভিচিন্তন

অভিচিন্তন মনোবিজ্ঞানের আলোকে চিন্তার মনস্তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। এ ছিল প্রথাগত মনোবিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্রস্থল, যখন কি-না মনোবিজ্ঞানের উপর আচরণবাদীদের (School of behaviourism) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্ভব ও সূচনা-কালে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব নিবদ্ধ ছিল মানুষের চিন্তা-পাঠে, অনুভবের ব্যাপকতায়, বুদ্ধির নির্মাণে। এই কতিপয় ডিসকোর্স ছাড়া অন্য কোনোভাবে শিক্ষা-বিষয়ে তা গুরুত্ব প্রদান করত না। আচরণবাদীদের (School of behaviourism) প্রচলিত তথ্য-তত্ত্ব নিয়ে স্বহালে বহাল ছিল অনেক দিন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন এসে এর অনেক কিছুই আমূল পাল্টে দেন। উদ্দীপক পন্থায় এবং প্রকাশ্য বাহ্যিক আলোড়নের পদ্ধতিতে যে পাঠ-গবেষণা সম্ভব, তাই মনোবিজ্ঞান শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে স্থিরতা পায়। অনুভব, বুদ্ধি ও চিন্তার উপাদানগুলো এমন সব ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত, যা সরাসরি বীক্ষণযোগ্য নয়। তেমনি এর পাঠ-গবেষণার জন্য যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হত, যেমন- অন্তর্বীক্ষণ (Introspection), সেগুলো এই বলে সমালোচিত হয় যে, তা বিজ্ঞ পরিশোধনের অনুপযুক্ত। এজন্যই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আচরণবাদীদের (School of behaviourism) একটি কামনা ছিল, একে সূক্ষ্ম অভিজ্ঞ জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে দাঁড় করানো; যা পরীক্ষণযোগ্য, বীক্ষণযোগ্য এবং প্রকাশ্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সপ্রাণ জগতের কাছে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ অনুভূত চিন্তিত প্রণোদনাকে তারা সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনার ফল হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এই প্রণোদনাকে একটি তালাবদ্ধ বাক্স হিসাবে বিবেচনা করেন, যার অন্তর্গত বিষয়সমূহের সূক্ষ্ম অবহিতি একেবারেই অসম্ভব। এ জন্য এর পাঠ-গবেষণায় সময় ব্যয় অনুচিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রণোদনার কারণে যে প্রকাশ্য আলোড়ন দৃষ্ট হয়, যাকে ধারণা করা যায়, যার উপর নির্দেশ চাপানো যায়; এসবই তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সম্পর্কে তাদের সহজ আদর্শ ধারণা হল যে, সে একটি অন্ধযন্ত্র, যা সীমিত পরিবেশের উদ্দীপক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়; যেন সে গবেষকের প্রার্থিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহে আলোড়িত হতে পারে। আচরণবাদের (School of behaviourism) প্রবক্তাগণ এই পর্যন্ত বলেন যে, চিন্তন-প্রক্রিয়া হল উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ ও আলোড়নের ঘনিষ্ট সামিষ্টিক রূপমাত্র, যা ব্যক্তির অন্তর্সংলাপ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। এটা এ জন্য যে, তারা মানুষের অন্তর্গূঢ় ভাবনার সকল প্রেরণা-প্রণোদনাকে উদ্দীপক ও আলোড়নের একটি শৃঙ্খলিত ধারাবাহিকতা হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জোর প্রদান করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, মনোবিজ্ঞান একটি সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে পরিগণিত হয়।

লেখক যেমন অন্য একটি গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মতো এই সূক্ষ্ম জ্ঞানকাণ্ডগুলোও কালের অনেক ব্যবধান পেরিয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক

ক্রম-বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুন তা শুধু অবচেতনভাবেই হয় নি। বরং নিরেট জড়-প্রকৃতি হওয়ার কারণে তা গুরুত্ববহ পথ অতিক্রম করে। এভাবেই সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম একক সমষ্টিতে পরিণত হয়, ব্যাপক তত্ত্বনিচয়ের রূপ লাভ করে; যা একই সঙ্গে জড়-আচরণ, শক্তি ও সীমিত পরিধিতে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞানকাণ্ডগুলো এই দুটি প্রবণতা ছাড়া এইভাবে এগুতে পারত না।

প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থেকে অণু-পরমাণু এবং তার উপাদান সৃষ্টি না হলে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক একটি জীবাণু জীব-বিদ্যার (biology) মৌলিক একক, এই জিনগুলোই প্রজনন-শাস্ত্রের (genetic) এককসমষ্টি। এভাবে উদাহরণ বৃদ্ধি করা যায়।

এখন কথা হল, মনোবিজ্ঞানে জীবজগতের আচরণের মৌলিক এককগুলো কী? অবশ্য আচরণের গূঢ় প্রকৃতিকে এককের মত উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। মনোবিজ্ঞানের এই শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য যদি কোনো ধারণাকে এখানে রাখা হয়, যেমন শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত কর্মচিন্তা; তা নিস্তেজ ও বিলুপ্ত হতে বাধ্য। শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত এই কর্মকে আমরা এই জটিলতাকে স্পষ্ট করার জন্য গ্রহণ করতে পারি। কারণ মনোবিজ্ঞানের সবচে' সহজ ডিসকোর্স হিসাবে তা একটি উত্তম প্রমাণ হবার যোগ্যতা রাখে। তাই আচরণবাদের (behaviourism) কতিপয় প্রবক্তাগণ একে নির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে আচরণের একক হিসাবে গণ্য করতেন। শর্তযুক্ত প্রতিবিম্বিত কর্ম যদিও সহজ-সরল শিক্ষাদান কর্মসূচীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যা প্রায়শই মনঃক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একে বাস্তবিক পক্ষে মনোবিজ্ঞানের একক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। কারণ, মনোবিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা, ডিসকোর্সই শর্তারোপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পায় না। যেমন- সামাজিক মনোবিজ্ঞান, মানবতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান (Humanistic Psychology), ইন্দ্রীয়ানুভব এবং ভাষা-শিক্ষা প্রভৃতির কোনোটাই শর্তযুক্ত শিক্ষার ধারণার উপর নির্ভর করে না, চাই তা ধ্রুপদী পদ্ধতিতে হোক অথবা উদ্দীপক বা আলোড়ক পদ্ধতিতে। তেমনি এ মানবিক আচরণের গভীর ও জটিল গূঢ় দিকগুলোর ব্যাখ্যায় অপারগ। উদাহরণ হিসাবে ভালবাসার ব্যাখ্যা সে কীভাবে করবে উদ্দীপক ও প্রতিবিম্বিত শর্তযুক্ত আলোড়নের পদ্ধতিতে? কারণ মানুষের গূঢ় আচরণ-প্রকৃতি এ সমস্ত কঠিন বিভাজনের উপযুক্ত নয়।

গ্লুকোজের শর্করা স্তর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সরলতার সাহায্যে মানবিক আচরণের স্তর-সৃষ্টির লক্ষ্যে শারীরিক, মানসিক ও সভ্যতাকেন্দ্রিক-আত্মিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের মিথস্ক্রিয়া একেবারেই অসম্ভব। যেমনটি ঘটে আলোকচিত্র গ্রহণের কর্মকাণ্ডের সময়ে, যখন পানি ও দ্বিতীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে শর্করা উৎপাদনের জন্য তৃণ সৌরশক্তি ব্যবহার করে।

মুসলমানদের জন্য সমস্যা আরো গভীর হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখতে পাই যে, মানবিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের হিসাব-বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আর তা হল, আত্মিক কর্মপ্রক্রিয়া। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ এর গুরুত্ব প্রকাশ করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যেহেতু মানবিক আচরণের একক উপাদান-সমষ্টি হিসাবে সভ্যতাকেন্দ্রিক, সামাজিক, জীবতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই তা আত্মিক ডিসকোর্সের তুলনায় অনেকটাই সহজ অথবা যেহেতু আত্মিক ডিসকোর্সকে আলোচনার বাইরে রাখে– তাই তা অনেক সহজ। কারণ আত্মার সম্পর্ক ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে, যা ক্রমান্বয়ে পূর্ণত রহস্যের মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর তা যেন কোনো বস্তুর অভ্যন্তরে কার্বন না থাকা সত্ত্বেও এর থেকে গ্লুকোজ-শর্করা নিস্কাষণের প্রত্যাশা রাখা অথবা বিশুদ্ধভাবে বলতে গেলে তা যেন সৌরশক্তিকে হিসাবে না রেখে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন- এই তিনটি রসায়ন উপাদানের মাধ্যমে গ্লুকোজের শর্করা নির্গমনের চেষ্টা করা শুধু আলোকচিত্র গ্রহণের প্রক্রিয়ায়। এ কাজটি এ তিনটি জড়-উপাদানের সীমানায় অত্যন্ত জটিল!

মানবিক আচরণের এই গূঢ়তার প্রকাশ্য রূপসহ যুগপৎ আত্মিক ডিসকোর্সকে পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের আওতাবহির্ভূত রাখার কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয়বারের মতো একটি ব্যাপক পূর্ণতত্ত্ব হিসাবে রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অথচ অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব বা ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানে একটি পূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো ঘরানা (School of thought) এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞগণ এ প্রচেষ্টা যে করেন নি, তা কিন্তু নয়। যেমন- মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব, সামগ্রিকতাবাদ (Gestalt theory) এবং শিক্ষণ-মনস্তত্ত্বের কতিপয় শাখা-প্রশাখাকে আবিষ্কার করা হয় ব্যাপক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় পুরোপুরি এবং এখন এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে আছে মাত্র।[৪]

তখন মনোবিজ্ঞান পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান হিসাবে পরিণত হয়। যেমন- আচরণবাদের (behaviourism) প্রবক্তাগণ বলে থাকেন; তারা মানুষকে তার অনুভূতি, বৌদ্ধিক পরিসীমা এবং গূঢ় চিন্তার পর্যায় থেকে সরিয়ে আনেন। অবশ্য অনেক পূর্বেই তাকে আত্মিক পরিসীমা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়েই

---

[৪] মালিক বাদরি, 'ইলম আল-নাফস মিন মানজুর ইসলামি', দেখুন- ইসলামি পদ্ধতিতে শিক্ষণ ও আচরণিক জ্ঞান : আন্তর্জাতিক ইসলামি চিন্তাবিষয়ক চতুর্থ সম্মেলনের গবেষণা ও পর্যালোচনা। তৃতীয় খণ্ড, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষণ পদ্ধতি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, হারন্ডন, ভার্জেনিয়া, ১৯৯২, পৃ : ৩৩১-৩৮২।

বৃটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'শার্ল ব্যারেট' ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন যে, "আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রথমে তার আত্মাকে হারায়, পরে অনুভূতিকে এবং শেষ পর্যন্ত তা একেবারেই বুদ্ধিহীন হয়ে আছে।"

অবশ্য আচরণবাদের ধারণা যে সমস্ত সমস্যা উত্থাপন করেছিল, তারা এর অধিকাংশের সমাধানের ব্যাপারেই অপারগ। অন্যদিকে আধুনিক পাঠ-গবেষণা জীবতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানে আচরণ-ভাবনার ধরন-ধারণ ও এর অভিজ্ঞতা বিষয়ে চরম বাহ্যিকতার জন্ম দিয়েছে। এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ে ভাষাশিক্ষা, ধারণা-নির্মাণ, সমস্যা-নিরসন এবং মানুষের কাছে তথ্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে। এজন্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে মনোবিজ্ঞান জ্ঞানতাত্ত্বিক ও চিন্তন-বিষয়ক কর্মপ্রক্রিয়ার যথাযথ মূল্যায়নে উদ্যোগী হয়। অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক মাধ্যমগুলোকে গুরুত্ব দিতে থাকে, যাকে মানুষ আপন পরিবেশ থেকে নির্গত তথ্যাদির সংকলনে-সন্নিবেশে ব্যবহার করতে থাকে। একই সঙ্গে মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে একে রেখাচিত্র হিসাবে গণ্য করে। বৈজ্ঞানিক এবং ধার্মিক দিক থেকে অভিচিন্তনের মূল্য নিরূপণের জন্য এই নতুন প্রবণতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রবণতার এই অবস্থাকে মনোবিজ্ঞানের আদি চরিত্রের উদ্‌ঘাটন হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে চাই তা মানুষের আচরণিক পাঠ-গবেষণা বা অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে হোক কিংবা কম্পিউটার বিস্ফোরণে– বর্তমানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসকল আধুনিক যুগে মনুষ্য-কর্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যম-উপায়ের উপর নির্ভর করে বেশি। এই সমস্ত পাঠ-গবেষণার ধারা মানুষের সীমিত যান্ত্রিক ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে, যা আচরণবাদীকর্তৃক সৃষ্ট এবং মনুষ্য-ধারণা হিসাবে নির্ধারণ করা হয় তথ্যাদির সংকলন ও সন্নিবেশের ব্যাপারে সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে মানুষের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তন-ক্রিয়া কম্পিউটার যন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ মানুষজনও নিজ পরিবেশ থেকে নানা উদ্দীপকের মুখোমুখী হয়, তখন সে এগুলোর প্রতীকায়নের কাজ করে, এগুলোকে বিন্যাস করে, এরপর তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যা-সমাধানের জন্য এর কাছেই ফিরে যায়।

এই ধারণা আচরণবাদের তুলনায় অনেক বাস্তবসম্মত। কারণ তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। তবুও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের যে ধারণা তা থেকে যোজন যোজন দূরে।

সন্দেহ নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সত্ত্বেও এই অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের পঠন-পাঠন সবসময়ই গূঢ়তম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাতে সকল উদ্দীপনা, আলোড়ন, প্রশ্ন-উত্তর পারস্পরিকভাবে এমনইভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, এর পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিকভাবে বিচার-বিবেচনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অভ্যন্তরীণ মনোজগত ও বৌদ্ধিক জগতের পঠন-পাঠন আমাদেরকে এমন একটি জটিল গূঢ়

প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়, যা নিয়ে প্রতিটি মানুষই ভাবিত অথবা ধর্ম-ভাবনা তাকে এ প্রশ্নের যোগান দেয়। আর তা হল বুদ্ধি এবং শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরনটা কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দার্শনিক চিন্তা, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পাঠ, অঙ্গসংক্রান্ত (organology) গবেষণা এবং মানুষের জীবতাত্ত্বিক (biologycal) বিষয়ের পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system)।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যদি বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বিষয়ে মতানৈক্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরি, তাহলে তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মনুষ্য-মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই আমাদের অজানা থাকলেও জড়বাদীগণ বলে থাকেন যে, মানুষের স্বতন্ত্র কোনো বুদ্ধি নেই। তবে এর দ্বারা শুধু সেই জড় মস্তিষ্ককে বুঝানো হয়, যা আমাদের সবাই নিজ খুলির অভ্যন্তরে বহন করে। তারা আরো বলেন, আমরা যেটাকে চিন্তক বুদ্ধি হিসাবে অভিহিত করি, তা মস্তিষ্কের রসায়নে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও বিদ্যুৎ-রসায়ন-কেন্দ্রিক (Electrochemical) স্নায়ু-কম্পনের প্রতিবিম্ব এবং এক রকমের রূপান্তর মাত্র। তাঁদের এ মতকে প্রমাণসিদ্ধ করেন এই যুক্তিতে যে, মানুষের ভাবনা-চিন্তা– এমনকি তার ব্যক্তিত্বও– মস্তিষ্কের সামান্যতম বিনষ্টিতে পরিবর্তন হয়ে যায়।

তাদের বিরোধী সম্প্রদায় এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়ে বলেন যে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক বুদ্ধিস্তর বিদ্যমান। এদের নেতৃত্বে আছেন বিখ্যাত স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ, স্নায়ুতন্ত্রের বিষয়ে মূল্যবান গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত Eccles[৫]। তিনি এবং তার অনুসারীগণ বলেন, মানব-মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের তৎপরতা বিষয়ে গবেষকগণ যে তথ্য-সমাবেশ করেছেন, বুদ্ধি বা অনুভবসম্পন্ন মনের অস্তিত্ব ব্যতীত এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অসম্ভব; যে বুদ্ধি বা অনুভব শক্তি মানুষের স্নায়ু-প্রক্রিয়া ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গবেষক এ ব্যাপারে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই। তিনি বলেন "যদি বৈদ্যুতিকভাবে আমরা মানব-মস্তিষ্কের কোন অংশকে স্পর্শ করি, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবো যে, তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। তখন যদি তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মস্তিষ্ক-স্পৃষ্টির পরও হস্তকম্পন হতে পারবে না; –অভিজ্ঞতার জন্য তা করা যেতে পারে– তাহলে সে অন্য হাতের সাহায্যে তার হস্তকম্পন রোধ করার চেষ্টা করবে।" এরপর তিনি এখানে প্রশ্ন রাখেন, "তার হস্তকম্পন তৈরি করল কে? কে-ই বা তা রোধে উদ্যোগী হল এবং তা রোধ করল?" জবাব স্পষ্ট : মস্তিষ্ক তাকে কম্পিত করেছে এবং বুদ্ধি কম্পন রোধ করেছে। অর্থাৎ এভাবেই বুদ্ধির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

---

[৫] John Eccles, 'Facing Reality : Philosophical Advetures by a brain Scientist', New York : Springer-Verlag, 1970.

এই সমস্ত বিজ্ঞানীগণ মস্তিষ্ককে টেলিভিশন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন এবং বুদ্ধিকে প্রেরণকেন্দ্রের সঙ্গে। টেলিভিশনে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে, তার বাহনকৃত বিষয়টি কখনো বিকৃত হয়ে পড়ে, কখনো না একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই যখন বলা হয় যে, মস্তিষ্কই সবকিছু– এমন ধারণা একটি সরলীকৃত বক্তব্য। এ যেন পুরোপুরি সেই ছোট্ট শিশুর মতো, যে ভাবে যে টেলিভিশনের পর্দায় যে সমস্ত দৃশ্য ও ব্যক্তির প্রকাশ ঘটছে, সবই এই বাক্সের অন্তর্গত।

এটা তো স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ ধর্মীয় নির্দেশনা ব্যতীত তা অসমাধেয় মৌলিক সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত হবে। যতই তাতে জীবতাত্ত্বিক (biology) ও অঙ্গতাত্ত্বিক (organology) বিষয়-আশয় থাকুক না কেন। যদিও দার্শনিক, ধর্মীয় ও মনোগত দিকের তুলনায় একে বেশ সহজ বলে মনে হয়। তবে বাস্তবতা হল, এর গূঢ়তা, জটিলতা কোনো অংশেই কম নয়। বরং কখনো কখনো এগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়। স্নায়ুতন্ত্র-বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মানব-মস্তিষ্কই আল্লাহর প্রশস্ত জগতে সবচে' জটিল। যেমন Uttal তার মূল্যবান গ্রন্থ[৬] (The Psychobiology of the Mind)-এ লিখেন যে, মানব-মস্তিষ্কের কর্ম-প্রক্রিয়ার পরিচিতির জন্য যত সমস্ত আবিষ্কার এবং আধুনিক গবেষণার উদ্ভব ঘটেছে, এর কোনোটাই বুদ্ধির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বিষয়ে মানব-ইতিহাসের যে জটিলতা রয়েছে, এর সমাধানে ন্যূনতম সহায়তা করতে পারে নি। বরং এই সমস্ত তথ্যাদির প্রেক্ষিতে উত্থাপিত বিষয়গুলো ভিন্নরকম প্রশ্নের রূপ নিয়েছে। একান্ত মৌলিক প্রশ্ন হিসাবে এ্যারিস্টটলের সময়ে যা উত্থাপিত হয়েছিল, দু-হাজার বছরের অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তা সন্তোষজনক উত্তরের অপেক্ষায়। আমরা এখন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম উপকরণ আবিষ্কার করেছি; তা সত্ত্বেও, মস্তিষ্ক যে প্রক্রিয়ায় মানুষকে চেতনা ও মৌলিক অনুভূতি প্রদান করে, তা আমাদের অজানা। অথচ মানুষ যা কিছুর স্বত্বাধিকারী– তার মাঝে এটাই সবচেয়ে মুল্যবান।[৭]

এই অবস্থা-ই মূলত আল্লাহর সৃষ্টিজগত বিষয়ে ভাবতে, অভিচিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে। চিন্তা ও ভাবনার প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। সেই সঙ্গে মানুষের উপর এই চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক, আত্মিক ও আচরণিক প্রভাব সম্পর্কেও। সুদানীয় কবি আল-তাজানি ইউসুফ বশির তার "বাস্তবতার বার্তাবাহীগণ" কবিতায় বুদ্ধিকে সম্বোধন করে যা বলেন, তা একান্ত সত্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন :

"প্রভু, তোমার সন্তুষ্টি দাও আমাকে। তোমার কুদরতি হাত কোত্থেকে নির্মাণ করল ঢেকে রাখা গোপন রহস্য, যা জীবনের সূচনাকাল থেকে তোমার কাছে বুদ্ধি নামে পরিচিত। জীবনকে যে পরিচালিত করে, বিন্যস্ত করে। প্রভু, তোমার সন্তুষ্টি দাও

---

[৬] W. Uttal, 'The Psychobiology of the Mind', John, London, 1978.

[৭] পূর্বোক্ত।

আমাকে। বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী হয়ে যে আত্মপ্রকাশে উদ্যোগী হয়, তার অস্তিত্ব গুপ্ত হয়ে পড়ে। কালের সম্মানকে উৎসর্গ করব নাকি মূল বস্তুর ছায়াকে? হে বুদ্ধি, হে বুদ্ধির সংশয়, তুমিই কি একমাত্র উপযুক্ত নও? তুমি কি একমাত্র শক্তি নও যা জীবনকে ধ্বংস করে, পরে নির্মাণ করে, কখনো কখনো সৃষ্টিজীবনকে করে তোলে উড়ন্ত ধুলোর মতো।"[৮]

সমস্যার এই জটিলতা সত্ত্বেও জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের গবেষকগণ মানুষের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধি ও চিন্তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গুপ্ত বিষয়ের অনেক কিছুই জানতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধি ও চিন্তার সঙ্গে ভাষার সূক্ষ্ম-সম্পর্কের সূত্রও। আধুনিক বৈদ্যুতিক গণিতবিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তারা এমন কিছু বিস্তৃত প্রোগ্রাম নির্মাণে সক্ষম হন, যা তথ্য-সন্নিবেশের ক্ষেত্রে মানব-বুদ্ধি যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে; তাকে স্পষ্ট করে তোলে। যেমন এটা স্পষ্ট যে, ভাষা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বোধনের মাধ্যম মাত্র নয়। বরং একটি মৌলিক শৃঙ্খলা-বিশেষ, যা মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে উপায়-পদ্ধতি অনুভূত বা আকারহীন অর্থকে শব্দের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে চলে, তার উপস্থিতি ব্যতীত শূন্য ধারণা-নির্মাণে, নিজ শক্তিতে অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে কর্ম-প্রক্রিয়ায় এবং বর্তমানের সঙ্গে এর সম্পৃক্তকরণে, ভবিষ্যতের কর্ম-পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ পথ নির্মাণে চিন্তন, স্মরণ ও অনুভব শক্তি থেকে প্রার্থিত উপকারিতা অর্জন করতে পারবে না। সম্মুখস্ত সমস্যাবলির উপযুক্ত সমাধানেও সক্ষম হবে না। চিন্তন-প্রক্রিয়া মূলত এই সমস্ত প্রতীকগুলোকে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার নামান্তর।

বরং কোনো কোনো বিজ্ঞানী, যেমন Whorf যিনি -Linguistic Relativity Hypothesis (ভাষাতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতবাদ) মতবাদে বিশ্বাসী– এর মতে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যে ভাষা ব্যবহার করে, তার বৈশিষ্ট্যই ঐ ভাষাগোষ্ঠীর চিন্তার উপায়-মাধ্যমগুলোকে সীমায়িত করে দেয়; তার যে জীবন-বাস্তবতা, তা ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ তাদের মতে, ভাষিক সংগঠন এবং ভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য– সবই সমাজের যাপিত জীবনের প্রকৃতিকে মূর্তায়িত করার মৌলিক প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে।

ভাষার গুরুত্ব বোঝার জন্য আমরা এই মতবাদটা স্পষ্ট করে নিতে পারি। কারণ তা যদি খণ্ডিত বা অখণ্ডভাবেও সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর টানেই আমাদেরকে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবতে হবে। আরব উপদ্বীপের সমাজ-জীবনে এর কী প্রভাব, তাও ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজ ওহি, কুরআন এবং সর্বোপরি সকল মানুষের জন্য ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য একেই নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এই ওহির সংরক্ষণ মানেই হল আরবি ভাষার সংরক্ষণ। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এভাবেই কুরআনের অলৌকিকত্ব স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে থাকবে।

---

[৮] আল-তাজানি ইউসুফ বশির, 'ইশরাকাহ', দার আল-সাকাফা, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রি, পৃ : ১৪-১৫।

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষক।" (আল-হাজার : ৯)

এই প্রেক্ষিতেই আল-আক্কাদ আরবি ভাষার সংগঠন, ধ্বনি মাধুর্য ও সুর বৈচিত্রের বর্ণনা দেন এই ভাষায় :

"মানুষের বাকযন্ত্র পরিপূর্ণ সাঙ্গীতিক মাধ্যম। প্রাচীন এবং আধুনিক কালে অন্য কোনো জাতিই আরবজাতির মতো এই মাধ্যমকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। কারণ বর্ণবিভাজনের ক্ষেত্রে সে ধ্বনিতাত্ত্বিক সকল গুণাবলি থেকেই উপকৃত হয়েছে।"[৯]

আক্কাদের বিশ্বাস, "আরবি ভাষার এই বৈশিষ্ট্যই কবিতাকে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।"[১০] যা আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় সহজলভ্য নয়। এ জন্য আক্কাদ আরো বলেন, "শব্দ এবং বর্ণের সাহায্যে মানুষ যতটুকু নিজ সম্পর্কে প্রকাশ করতে পারে, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আরবি বাগ্মিতা এর শীর্ষচূড়ায় পৌঁছেছে।"[১১]

এ জন্য "সেমিটিক ভাষার বিস্তৃত ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক আর্নেস্ট রেনান আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের বহনে এর প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি যে বিস্ময়-বাক্য উচ্চারণ করেন, তা জেনে নিতে পারি। তিনি বলেন:

"একটি যাযাবর জাতির মুখে বিশাল মরু-প্রান্তরে একটি শক্তিমান ভাষার জন্ম এবং সেই সঙ্গে এর অস্বাভাবিক পূর্ণতা– সবই অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই ভাষা শব্দের সংখ্যাধিক্য, অর্থের সূক্ষ্মতা এবং সুষম গঠন ও নির্মাণের দিক থেকে সমপর্যায়ের সকল ভাষাকে অতিক্রম করে যায়। এই ভাষাতো পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যখন এর পরিচয় উদঘাটিত হল, তখন তা পূর্ণতার অলঙ্কারে সজ্জিত, অথচ এতে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ন্যূনতম স্পর্শ লাগে নি। এমনকি এই ভাষা-জীবনের কোনো স্তর-বিন্যাস নেই। নেই শৈশব বা বার্ধক্য। অপ্রতিরোধ্য বিজয় ও অভিযান ছাড়া এর বিষয়ে কিছু জানা যায় না। গবেষকদের সামনে ক্রমবিবর্তনহীন পরিপূর্ণ একটি ভাষার সমতুল্য আর কোথাও চোখে পড়ে নি এবং যা আজও সকল বিবর্তন ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।

এক সময় আরবি ভাষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং দূর-দূরান্তের দেশ ও নগরে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১২]

---

[৯] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, 'আল-লুগাহ আল-শায়িরাহ', গারিব লাইব্রেরি, পৃ : ১৬।

[১০] পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০।

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।

[১২] আর্নেস্ট রেনান, আনওয়ার আল-জুনদি রচিত 'আল-ফুসহা লুগাহ আল-কুরআন' গ্রন্থে উল্লিখিত, দার আল-কিতাব আল-লুবনানি, ১৯৭২, পৃ : ২৭।

চিন্তন-প্রক্রিয়ার মৌলিক শৃঙ্খলা হিসাবে ভাষার গুরুত্ব-বিষয়ক অপ্রয়োজনীয় আলোচনার পর আমরা মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, যেখানে তারা মানুষের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও তৎপরতা বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী ও সচেষ্ট। তাই দেখতে পাই যে, তারা এখানে কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে জড়িয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানী ও কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞগণ স্মৃতিতে তথ্য-সংকলন, সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতার পরিধি এবং প্রয়োজনমতো তা ব্যবহারের দক্ষতা বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। চিন্তন-ক্রিয়া ও সমস্যা-সমাধানে মানুষ যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে, এর পরিচয় উদঘাটনের জন্য তারা অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করেই তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম নির্মাণ করেছেন, যা মানুষের কাছে জ্ঞানতাত্ত্বিক তৎপরতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বরং কেউ কেউ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মানসিক রোগী ও মনোবৈকল্যগ্রস্থরা যে চিন্তা-পদ্ধতি অনুসরণ করে, এর প্রকাশের জন্য একটি প্রোগ্রাম নির্মাণ করেছেন। সন্দেহ নেই, এই সমস্ত গবেষণা সেই সব দিকগুলোর দরোজা খুলে দিয়েছে, যার বিষয়ে আচরণবাদীগণ বলতেন যে, তা হল একটি তালাবদ্ধ বক্স, এর অভ্যন্তরে প্রবেশের কোনোই সুযোগ নেই। তেমনি তা অনেক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেছে, যা উদ্দীপক ও আলোড়নের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে সহজ কল্পনার সাহায্যে উদঘাটনে অক্ষম ছিল। মুসলিম মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের জন্যও একটি জানালা খুলে দিয়েছে, যাতে তারা ইবাদত হিসাবে চিন্তন-অভিচিন্তনের গুরুত্ব এবং এর পরিপার্শ্বিক অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে পারেন।

এই সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠ-গবেষণার মাধ্যমেই ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তন-প্রক্রিয়া, তার অনুভব-অনুভূতি ও কল্পনার উপায়-স্বরূপ জানতে পারেন, যা তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আচরণবাদীগণ মানুষের ব্যক্তি-নির্মাণের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক আচরণের বিশ্লেষণে উদ্দীপক নানা উপাদানসহ পরিবেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে পরিবেশের উদ্দীপক উপাদানই সরাসরি আচরণিক আলোড়নকে প্রতিফলিত করে। অবশ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ উদ্দীপক উপাদানগুলো মানুষের মাঝে যে অর্থে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাকেই অধিক গুরুত্ব দেন। উদ্দীপক উপাদান সরাসরি আলোড়নকে বাধ্য করে না। তবে তা শুধু জাড্য ইচ্ছাবহির্ভূত প্রতিবিম্বিত অবস্থার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন উষ্ণতার স্পর্শে হাত গুটিয়ে যায়। গূঢ় আলোড়নের ব্যাপারটি মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুগত সিদ্ধান্ত, প্রকাশ্য আচরণ এবং গভীরের বিশ্বাস– সব কিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। তখন রূপ ধারণ করে ভাবনা, অর্থ, পরিবেশ-পরিস্থিতি কেন্দ্রিক উদ্দীপনা,

অনুভূতি থেকে উদ্ভূত পূর্বাজ্ঞিতা। অন্যকথায়, মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, তাই তার বিশ্বাস ও আচরণে প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন তার ভাবনা হবে আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল ও তার নেয়ামত বিষয়ে, তাতে তার ইমান-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কার্যকরী এবং আচরণিক উন্নতি ঘটবে। যদি তার চিন্তা নিবদ্ধ থাকে আপন স্বার্থ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে, তাহলে তা তাকে ধর্মচ্যুত করবে এবং আচরণিক অবনতি ঘটবে। যদি তার ভাবনা নিবদ্ধ থাকে ভীতিকর বিষয়ে, অবনতি-পরাজয় ও দুর্ভাগ্য বিষয়ে; তাহলে তা তার আলোড়ন-কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তার সমস্যা এবং অন্যান্য মানসিক রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা-ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতিকেন্দ্রিক চিন্ত া-পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ সেই চিন্তন-প্রক্রিয়া যা সাধারণত সুস্থ-অসুস্থ, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকদের কাছে প্রতিক্রিয়ামূলক আলোড়নকে অতিক্রম করে যায়। অধিকাংশ সময়ই যখন দ্রুত গতিতে সরাসরি এই জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তন-প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে, তখন দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও গভীর না হলে স্বাভাবিকভাবে নজরে তা পড়ে না।

এই সমস্ত বিশেষজ্ঞগণ এটা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ স্বেচ্ছায় যে কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তার পেছনে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তন-প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে। মনুষ্য-বুদ্ধি রাত ও দিনের কোনো একটি মুহূর্তেও চিন্তন-প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকে না– চাই তা সচেতনভাবে হোক, অথবা অবচেতনভাবে। অনেক সময়ই মানুষ একটি গূঢ় সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিরত থাকে, যখন সমাধানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তা পরিত্যাগ করে, অন্য একটি কর্ম-প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখনই– হঠাৎ অবচেতনভাবেই সেই সমস্যার বিশুদ্ধ বা প্রত্যাশিত একটি সমাধান বের হয়ে পড়ে। এর একটি ধ্রুপদী উদাহরণ অ্যারিসমেডিস কর্তৃক হঠাৎ শূন্যে ভাসমানতার তত্ত্ব আবিষ্কার। তেমনি যে ব্যক্তি কারো নাম বা নির্দিষ্ট একটি শব্দ স্মরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে, সামান্য পরেই তা তার স্মরণে আসে আকস্মাৎ; যা পূর্ববর্তী উদাহরণের মতোই।

সুতরাং মানুষের অভ্যন্তরীণ চিন্তন-প্রক্রিয়া ব্যক্তির অনুভূত হোক না হোক– তা তার আচরণকে নির্দেশ করে, বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের আচরণকে ব্যাপক ধারণাসহ একটি সীমিত তত্ত্বের মাঝে সিপি-আঁটা করবার জন্য সকল ঘরানা (School) দীর্ঘদিন যাবৎ যে গবেষণা করে আসছে, সে বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের এটাই হল সার-নির্যাস। এই সার-নির্যাস ইসলাম নির্ধারিত পদ্ধতিকেই সত্যায়ন করে যে, আল্লাহর সৃষ্টজীব বিষয়ে অভিচিন্তনই ঈমানের মূল মেরুদণ্ড, যার থেকে সকল উত্তম কর্মের উদ্ভব ঘটে থাকে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, সকল কাজের সূচনা-ই ঘটে থাকে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেমন মনোকথা, ধারণা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও

প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। তেমনই তাদের সিদ্ধান্ত যে, এই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার শক্তি যখন বৃদ্ধি পায়, তখনই তা আচরণের উদ্‌গাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ব্যক্তি যখন আচরণের জন্ম দেয় এবং তার পুনরাবৃত্তি করে, অভ্যন্তরীণ চিন্তা-শক্তি তখনই সরাসরি এই কর্ম বাস্তবায়নের শক্তি অর্জন করে। আর এভাবেই তা সুদৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হয়। জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানীগণ যখন এই সমস্ত অভ্যাসের চিকিৎসায় নিয়োজিত হন, পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন; তখন তাঁদেরকে অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রক্রিয়া ও অনুভূতি-তলকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে পবে প্রথমেই। তার অভ্যাস যদি হয় উদাহরণত সামাজিক অবস্থানের আশঙ্কা, তাহলে চিকিৎসককে অভ্যন্তরীণ সেই চিন্তা-প্রক্রিয়ার উপর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, যা সামাজিক ভীতি থেকে জন্ম লাভ করেছে এবং রোগীকে এর পরিবর্তনে সহায়তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে। যেন রোগীর জন্য এটা প্রতিভাত হয় যে, এই সমস্ত চিন্তা-প্রক্রিয়ার বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই, বরং সবই ভাসা ভাসা ধারণা ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত– শরীরের সুস্থতায় যার ন্যূনতম নির্ভরতা নেই। অবশ্য রোগীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা এ বিষয়ে এতটায় দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, তা তার আচরণে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে। কখনো কখনো রোগী ভাবে যে, যদি সে অন্যের সামনে কথা বলে বা অপরিচিতের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে; তাহলে সে ঠাট্টা বা উপহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে, অথবা সে যদি একদল মানুষের সামনে বক্তব্য প্রদান করে, তখনও এমন হতে পারে। কিন্তু যখন তার অভ্যন্তরীণ চিন্তা-প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত হবে, তখন তার আচরণও সে অনুসারে পাল্টে যাবে।

তেমনিভাবে এই মনোচিকিৎসা অভ্যাসগতভাবে প্রোথিত পারস্পরিক বিরোধী অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া, ধারণা ও চিন্তাধারার আলোড়নের উপাদানগুলোকে জাগ্রত করে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। যদি সামাজিক অবস্থান থেকে ভীতি-সঞ্চারের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে চিকিৎসক রোগীর অনুভবে প্রশান্তি ও মানসিক স্বস্তি ফিরিয়ে দেবেন সময়োপযোগী পদ্ধতিতে, ক্রমোন্নীত দৃঢ়ীকৃত সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে। হয়ত সামাজিক বাস্তবতার সত্যতা স্পষ্ট করে অথবা তার ধারণাস্থিত পথের দিক থেকে। কিন্তু ব্যক্তি যদি স্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়, মানসিক আনন্দোপভোগে উৎসাহী হয়; তখন চিকিৎসককে এর তীব্র বিরোধী উপাদানের সাহায্যেই চিকিৎসা সম্পন্ন করতে হবে। পুনরাবৃত্ত অভ্যাসের মূলোৎপাটনের জন্য চিকিৎসক রোগীর মনে কষ্ট, ভীতি ও মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাবেন। যেমন মাদক-দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে রাসায়নিক উপাদানের মাধ্যমে ইনেজকশন দেবেন, মদ্য পানের বেলায় যা তার বিতৃষ্ণার এবং অনীহার উদ্রেক করবে। তেমনি তাকে বেদনাদায়ক ইলেট্রিক শকও দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয়, বিপরীত বা বিরোধী উপায়ে চিকিৎসা-প্রদান (Reciprocal Inhibition)। এটাই আধুনিক আচরণবাদীদের সমর্থিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি যদিও আচরণবাদীগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত, কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক

মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ এর উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, রোগীর অনুভব-অনুভূতি ও চিন্তা-প্রক্রিয়াকে পারিপার্শ্বিকতাসহ গভীরতা দান করেছেন। আবার জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ মনোরোগীর অভ্যাসগুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরণের উৎস হিসাবে যা মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, সেই ভ্রান্ত মূল্যবোধগুলো এবং চিন্তা-প্রক্রিয়ার পরিচয় লাভের জন্য ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

সুতরাং বলা যায় যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান মানুষের কল্পনা, ভাবনা, প্রতিক্রিয়া এবং অনুভূত পর্যায়ের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এই অনুভূত স্তরই জীবনভিত্তিক কল্পনাধারাকে রূপায়ণ করে, তার বিশ্বাস-মূল্যবোধ নির্মাণ করে এবং তার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বহির্ভূত আচরণকে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।